সংবাদ

তারিখ 30 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার ক্রমাবনতি

বিধান মিত্র

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিজ্ঞান ও অর্থ পরস্পর পরস্পরের হাত ধরে চলেছে। আধুনিক যুগ যেমন বিজ্ঞানের সোনালি যুগ, তেমনি তা অর্থের অতল প্রভাবে কারবারের যুগ হিসেবেও সমানভাবে বিবেচিত। বস্তুত মানুষের দৈনন্দিন জীবন প্রবাহে প্রথম প্রয়োজন অর্থের। কারণ প্রথমে তাকে খেয়ে-পরে বাঁচতে হয়। এ দুটি নিশ্চয়তার পর ব্যক্তিক বা সামাজিক জীবনে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গটি আসে। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও তাই। প্রথম প্রয়োজন তার টাকা। পরে বিজ্ঞানের বিস্তার। বিজ্ঞানসমৃদ্ধ পৃথিবীর সব দেশ আগে অর্থে শোভিত। পরে মনোযোগী হয়েছে বিশেষ জ্ঞানে। একথা আজ অনস্বীকার্য যে, বিজ্ঞান সহজেই অর্থের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নিতে পারে। তবে অর্থ বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণকারী হতে পারে না। তাই দেখা যায়, যে দেশ বিজ্ঞানে উন্নত, তারা অর্থে তেমন সমৃদ্ধ। কিন্তু বিত্তবান সব দেশ বিজ্ঞানে বিভূষিত হয় না। যেমন মধ্যপ্রাচ্যের তেলতেলে দেশগুলো। এর কারণ বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য মস্তিষ্ক লাগে, সে তীক্ষ্ণ মস্তিষ্ক অর্থকে টেনে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। তবে অর্থনৈতিক উন্নতির ক্ষেত্রে মেধা না হলেও চলে। এতে প্রকৃতির আশীর্বাদটুকু (স্বর্ণের খনি, গ্যাসের খনি, তেলের খনি) থাকলেই কেল্লাফতে। বিজ্ঞানের সমৃদ্ধি মেধা ও শ্রম দিয়ে অর্জিত। অর্থের আয়েশ, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভাগ্যগুণে প্রাপ্ত। বিজ্ঞান সাধনালব্ধ বিষয় বলে এর দাপট অর্থের চেয়ে অনেক বেশি।

কবি বহু বছর আগে (১৩০৭) বলেছিলেন :

কঠিন তব নূপুর ঘেঁষে আর বসে না রইব।
এটা আমি স্থির বুঝেছি, ভিক্ষা নৈব নৈব।
যাবই আমি যাবোই ওগো, বাণিজ্যেতে যাবই।
তোমায় যদি না পাই তবু আর-কারে তো পাবই।

'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'-এ আপ্তবাক্যে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন এবং তিনি বাগদেবীর একান্ত সাধক হয়েও বাণিজ্যদেবীর উপাসনা কম করেননি। তার সমকালীন বা পরবর্তী প্রজন্ম এই আহ্বানে সাড়া দেয়নি। তবে বাংলাদেশের নতুন প্রজন্ম 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী'-এ কথায় এমন ভয়াবহভাবে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছে যে, তাতে কলাদেবী বিজ্ঞানদেবীর নাভিশ্বাস শুরু হয়ে গেছে।

বর্তমান যুগ ইন্টারনেট-কম্পিউটার-মোবাইল ফোনের যুগ। কথায় কথায় এই যে 'গ্লোবাল ভিলেজ'-এর স্বপ্নের কথা বলা হচ্ছে, এর মূলে আছে বিজ্ঞানের বিস্ময়কর জয়যাত্রা। এখন উন্নত দেশগুলো তো বটেই, এমনকি স্বল্পোন্নত দেশগুলোও বিজ্ঞানের পাখায় ভর করে উড়তে চাইছে আকাশে। এ জন্য তারা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বিজ্ঞানকে যেমন গুরুত্ব দিচ্ছে, তেমনি উচ্চ পর্যায়ের গবেষণাগার খুলে বিজ্ঞানের আলোয় সবাইকে উদ্ভাসিত করতে সচেষ্ট হয়েছে। এক্ষেত্রে বিস্ময়কর ব্যতিক্রম দেশটির নাম বাংলাদেশ। কারণ? পৃথিবীর সব দেশে যখন বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটছে তখন আমাদের দেশে এ শিক্ষার ক্ষেত্রটি ক্রমান্বয়ে সঙ্কুচিত হয়ে আসছে।

১৯৭৪ সালের বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন এবং ১৯৮৮ সালের বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন বিজ্ঞান শিক্ষার ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিল। প্রথম কমিশনটি (যা ড. কুদরত-এ-খুদা কমিশন নামে পরিচিত) সুপারিশ করল, 'মাধ্যমিক ও তদূর্ধ্ব স্তরে বিজ্ঞান সিলেবাসকে বিশিষ্যভাবে নীত করতে হবে যাতে অল্পকালের মধ্যেই থবীর উন্নত দেশের মানের সমকক্ষতা র্ন করা যায়।' এই সুপারিশের প্রেক্ষিতে যে পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হলো এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল দেশের আর্থ-সামাজিক প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে অর্থপূর্ণভাবে বিজ্ঞান শিক্ষার পুনর্বিন্যাস এবং তা আরও ব্যাপকসংখ্যক ছাত্রছাত্রীর কাছে সহজলভ্য করে তোলা। তখন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি কমিটি সুপারিশ করেছিল, নবম ও দশম শ্রেণীর সব শিক্ষার্থীর জন্য বিজ্ঞানের মূল বিষয়গুলো সমন্বিত করে দুই পত্রের (ভৌত বিজ্ঞান ও জীবন বিজ্ঞান) সাধারণ বিজ্ঞানের পাঠ্যসূচি প্রণীত হবে। প্রথম পত্রে থাকবে বিজ্ঞানের প্রকৃতি, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন। দ্বিতীয় পত্রে থাকবে উদ্ভিদবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, স্বাস্থ্যনীতি ও পুষ্টি, জীববিদ্যার প্রয়োগ, জনসংখ্যা শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদি। নবম শ্রেণীতে বিজ্ঞানের এই পাঠ্যসূচি ১৯৮৩ সালে চালু করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষকের স্বল্পতা ও বিজ্ঞান শিক্ষা দানে উপযোগী পরিবেশের অভাবে এই পাঠ্যসূচিকে আবশ্যক না করে নৈর্বাচনিক করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। বস্তুত এ সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আমাদের বিজ্ঞান শিক্ষার অগ্রযাত্রা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে পড়ে।

মানুষ হাঁটে সামনের দিকে। আর ভূতেরা নাকি পেছনের দিকে হাঁটে। বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান ভূতের মতো। আমরা সামনে নয়, কেবল পেছনের দিকে হাঁটছি। পৃথিবী এখন বিজ্ঞান শিক্ষায় দৃঢ় প্রত্যয়ী। দেশে দেশে এ শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বাড়ছে, বাড়ছে শিক্ষার্থীর সংখ্যা। কিন্তু আমাদের দেশে মোট শিক্ষার্থীর অনুপাতে শোচনীয় এবং আশঙ্কাজনকভাবে কমে যাচ্ছে বিজ্ঞান পড়ুয়ার সংখ্যা। আমাদের নতুন প্রজন্ম মানবিক ব্যবসায় প্রখর নিবেদিত হতে চায়, বিশেষ জ্ঞান অর্জনেই তাদের যত আপত্তি। আপত্তির কারণ? বঙ্গীয় তরুণরা যাযাবরের সেই বিখ্যাত উক্তিটি বোধ হয় জানে এবং মানে, 'আধুনিক বিজ্ঞান মানুষকে দিয়েছে বেগ, কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। তাতে আছে গতির আনন্দ, নেই যতির আয়েশ।'

ফি বছর পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটছে। আশির দশকে বাংলাদেশের স্কুল-কলেজগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের আশাপ্রদ পদচারণা ছিল। কিন্তু এরপর প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে যেমন মফস্বল শহরেও বিজ্ঞান শিক্ষায় ধস নামতে শুরু করে। ব্যাপারটা খোলাসা করার জন্য আমি প্রত্যন্ত গ্রামের দুটি স্কুল ও কলেজ এবং মফস্বর শহরের একটি বড় প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞান-শিক্ষার্থীদের ক্রমহ্রাসের একটি সরণি উপস্থাপন করছি।

সাল	গোপালাশ্রম হাইস্কুল	তেলিগাতী ডিগ্রি কলেজ	নেত্রকোনা সরকারি কলেজ	
	নবম শ্রেণী	একাদশ	স্নাতক ১ম বর্ষ	স্নাতক ১ম বর্ষ (সম্মান)
১৯৮৭	১৬	৪২	২৯	-
১৯৯৭	১০	৩৩	২২	১৩১*
২০০৬	০৮	২১	১৭	৮৫*
২০০৭	০৫	১২	১১	৫৯*

* পদার্থ, গণিত, উদ্ভিদ ও প্রাণিবিজ্ঞান এ চার বিষয়ের শিক্ষার্থীর যোগফল।

ভয়াবহ তথ্য হচ্ছে, গত ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে উপরোক্ত কলেজটির পদার্থবিজ্ঞানের সম্মান শ্রেণীতে একজন শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়নি। এ অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাঙ্গন গুরুদয়াল কলেজের অবস্থাও তাই। ময়মনসিংহ অঞ্চলের প্রাচীন ও বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ আনন্দমোহন কলেজ বিজ্ঞান বিভাগের সব বিষয়ে প্রচুর আসন ফাঁকা পড়ে থাকে। অথচ এক দশক আগে এখানে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তি হওয়ার জন্য কঠিন প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হতো। বস্তুত উপরিল্লিখিত শিক্ষাচিত্রটি ময়মনসিংহ অঞ্চলের বটে। তবে সারা বাংলাদেশের বিজ্ঞান শিক্ষার চিত্রটি এর থেকে বিন্দুমাত্র ভিন্ন নয়। অর্থাৎ দেশে বাড়ছে জনসংখ্যা, বাড়ছে শিক্ষার্থী, কমছে কেবল বিজ্ঞানের ছাত্রছাত্রী। বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির যুগে আমাদের নবীন প্রজন্মের বিজ্ঞান বিমুখতার কারণ কী?

এ পর্যায়ে কেউ হয়ত বলতে পারেন দেশে সরকার নিয়ন্ত্রিত কলেজগুলোর বিজ্ঞান বিষয়ের অনার্স শ্রেণীতে শিক্ষার্থী হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রযুক্তিনির্ভর আপাত উজ্জ্বল হাতছানি। প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞান শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছে সেখানে। কথাটা মানলাম বটে। তবে সেই সঙ্গে প্রশ্ন রাখা যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের বিজ্ঞান শিক্ষার্থী শোচনীয়ভাবে হ্রাস পাচ্ছে কেন? গ্রামাঞ্চলের স্কুল-কলেজগুলোতে এমন চিত্র বিরল নয়, যেখানে বিজ্ঞান বিষয়ের মোট শিক্ষার্থী অপেক্ষা এতদসংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মচারী সংখ্যা বেশি হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অনেকটা মুখস্থনির্ভর। এখানে বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ, পরীক্ষণের সুযোগ খুব কম। এছাড়া এদেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থী বিদ্যাপীঠে যায় সার্টিফিকেট অর্জন করে চাকরি বাগানোর প্রত্যাশায়। এদের মধ্যে জগৎ ও জীবনকে জানার আগ্রহ সীমিত। গবেষণা করার প্রত্যয় দুর্নিরীক্ষ্য। বর্তমান ব্যবসানির্ভর সমাজে শিক্ষার্থীরা লাভের হিসাব বুঝে। বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক উপাত্ত তাদের আকর্ষণ করে না। মেধাবী শিক্ষার্থী যারা বিজ্ঞান পড়ে তারা কাঁচা পয়সা উপার্জনের জন্য ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হতে চায়, বিজ্ঞানের গবেষক হতে চায় না। আরও একটি ভয়াবহ দিক হচ্ছে, অনেক শিক্ষার্থী মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে অধীত বিদ্যাকে খারিজ করে দিয়ে চাকরি নিচ্ছে প্রশাসন, পুলিশ ও কাস্টমসে। আমাদের সমাজে একজন ডাক্তার কেন ম্যাজিস্ট্রেট হতে চায়, একজন ইঞ্জিনিয়ার কেন ঢুকতে চায় পুলিশ বিভাগে- এর কারণ খুঁজে বের করার জন্য খুব মেধাবী হওয়ার প্রয়োজন আছে কি?

প্রশ্ন হলো, বিশ্ব যখন বিজ্ঞানের প্রতি ঝুঁকছে তখন আমাদের নতুন প্রজন্ম একুশ শতকে এসে বিজ্ঞান থেকে সরে আসছে কেন? সেই নব্বই দশকে এদেশের একজন প্রথিতযশা বিজ্ঞানী লিখেছিলেন, 'গত দু'দশকে দেশে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা বহুগুণে বেড়েছে। এই সময়ে মোট শিক্ষার্থীর প্রায় চল্লিশ শতাংশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার ক্ষেত্রে অধ্যয়ন করছে।' কিন্তু আজ? বিজ্ঞান শিক্ষার সেই গতি হঠাৎ থেমে গেল কেন? কেন আমাদের শিক্ষার্থীরা, বিজ্ঞানবিমুখ হয়ে কলা ও বাণিজ্যের প্রতি অন্ধের মতো ঝুঁকে যাচ্ছে?

অবশ্য বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা আছে। ড. আবদুল্লাহ আল মুতী শরফুদ্দীনের ভাষায়, 'গুণগত দিক থেকে বিজ্ঞান শিক্ষার সমস্যা অনেক। শিক্ষাক্রম সেকেলে ও অনুপযোগী, পাঠদান পদ্ধতি দুর্বল। যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণের অভাব প্রকট।' তার সুচিন্তিত অভিমত; 'বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু যে বিষয়বস্তু আধুনিকীকরণ প্রয়োজন তা নয়, শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত করতে হবে অনুসন্ধান ও গবেষণার প্রবণতা, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং দেশের আর্থসামাজিক সমস্যা সমাধানের প্রেরণা।' বস্তুত ড. শরফুদ্দীনের মন্তব্যের শেষ অংশটির সূত্র ধরে আমরা এদেশের বিজ্ঞান শিক্ষার শোচনীয় বিপর্যয়ের কারণটি খুঁজে বের করতে পারি। আমাদের তরুণ প্রজন্ম আজ আর অনুসন্ধান ও গবেষণার ঝামেলায় জড়াতে চায় না। বিজ্ঞানের জটিল সমস্যা নিয়ে তারা নিজেরা সমস্যায় পড়তে অনিচ্ছুক। তারা চায়, সহজ, সরল ও সোজা পথ, যেখানে কপালে চিন্তার ভাজ পড়বে না, রাত জাগার ক্লান্তি থাকবে না, তত্ত্ব-উপাত্ত সংক্রান্ত ঝামেলা থাকবে না। লাভালাভে আন্দোলিত আমাদের নবীন প্রজন্ম স্বল্প পরিশ্রমে সার্টিফিকেট চায়, আয় রোজগারের উপায় চায়, জ্ঞান অর্জন করতে চায় না। তারা বিত্ত চায়, বিজ্ঞান চায় না।

আগেই বলেছি, দেশে মোট শিক্ষার্থী বাড়ছে, কমে যাচ্ছে বিজ্ঞানের শিক্ষার্থী। তাহলে প্রশ্ন হলো- বুদ্ধিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞানকে পাশ কাটিয়ে কোন দিকে ঝুঁকছে? ব্যবসা, ব্যবসা হ্যাঁ, ব্যবসা শাখার দিকে স্রোতের মতো ধেয়ে যাচ্ছে তারা। কী উচ্চমাধ্যমিক, কী সম্মান শ্রেণী সব ক্ষেত্রে এখন বাণিজ্য বিভাগের জয়জয়কার। স্কুল-কলেজের বিজ্ঞান শাখাগুলো যখন ছাত্র স্বল্পায় ধুঁকছে (নামিদামি প্রতিষ্ঠানগুলো বাদে) তখন বাণিজ্য বিভাগে ভর্তি হওয়ার জন্য অনার্স শ্রেণীতে প্রবল প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আগেই উল্লেখ করেছি, ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে নেত্রকোনা সরকারি কলেজের অনার্স ক্লাসে বিজ্ঞানের চারটি বিষয়ে মাত্র ৫৯ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। অন্যদিকে ওই কলেজের হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে (১৭৫+১৭৫) জন মোট ৩৫০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পেরেছে। প্রায় সমসংখ্যক শিক্ষার্থী ওই দুটি বিষয়ে ভর্তির সুযোগবঞ্চিত হয়ে হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় কলেজ আঙ্গিনা ত্যাগ করেছে। অনুরূপ চিত্র দেখা গেছে গুরুদয়াল কলেজ কিংবা শেরপুর সরকারি কলেজেও।

মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক এবং বিশেষত উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে বাণিজ্য বিভাগ প্রীতি অবশ্যই নিরানন্দের খবর নয়। তবে এতে যত না আনন্দের দ্যুতি আছে, তার চেয়ে অনেক বেশি হতাশার মস্যাধার পীড়িত করে বিজ্ঞান শিক্ষার দুরবস্থা দেখে। বিজ্ঞানের সর্বপ্লাবী এ নিয়ে সবারই ভাবা উচিত নয় কি?

তথ্য সূত্র :
১. বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী- ক্ষণিকা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
২. দৃষ্টিপাত-যাযাবর
৩. বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা- ড. আবদুল্লাহ আল মুতী

[লেখক : সহকারী অধ্যাপক, কিশোরগঞ্জ সরকারি মহিলা কলেজ।]